ড. এ. কে. এনামুল হক

মাটি, ঘাস ও আমাদের প্রাণশক্তি

কথা হচ্ছিল আমার এক চীনা বন্ধুর সঙ্গে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা হয়। সেই ১৯৮৬ সালে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ১৯৯১-তে দেশে ফেরার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তখন আমার ই-মেইল ছিল না। পরে যখন হলো তখন সে তার প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য কোথাও পাড়ি দিয়েছে। তার নাম মনে ছিল। কিন্তু জানতাম যে সে নাম বদল করেছে। তার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখন তার নাম পুরোটাই ছিল চীনা। কানাডায় থাকার সময় সে যখন অভিবাসনের জন্য চেষ্টা করছিল তখন তার নামের খানিক অংশ বদলিয়ে ইংরেজি বা ক্রিশ্চিয়ান নাম রাখে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন বদলালে? বলল, এ দেশেই যখন থাকব, তবে আমি কেন নিজেকে বৈষম্যের শিকার করব। তাই নাম বদলালাম। অন্তত চাকরির ক্ষেত্রে আমাকে কেউ শুরুতেই বাদ দেবে না। আর আমার পরিচিতদের কাছে আমার নাম বদলাবে না। আমার কাছে বিষয়টি অবাক লেগেছিল। মা-বাবার দেয়া নাম বদলালে? বয়সে সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিল কিন্তু তার আচরণে সবসময়ই ছিল পরিণত। আমি যখন পিএইচডি করি তখন সে বলল, সে আর পিএইচডি করবে না। তার মূল বিষয় ছিল কম্পিউটার সায়েন্স। সে সেখানেই ফিরে যাবে কিন্তু অভিবাসন আইন তাকে আটকে দিল।

সে তখন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদে গেল। সেখানে কী করে শিক্ষার সঙ্গে আইটির সংযোগ ঘটানো যায়, সে বিষয়ে তার পড়াশোনা চলছিল। কম্পিউটার বিজ্ঞানের কাছাকাছি কিছু পড়তে তার ভালোই লাগছিল। আর সে অপেক্ষা করছিল তার অভিবাসনবিষয়ক দলিলাদি হাতে আসার। এ সময় আমি দেশে চলে এলাম। ফেসবুক হওয়ার পর তাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি।

তার কথা বলছি পরে। তবে আরো কয়েকটি সংবাদ দিই। আমার আরেক বন্ধু ছিল থাইল্যান্ডের। সেও আমার সঙ্গে পড়াশোনা করত। এমএস করার পর সে ফিরে গেল থাইল্যান্ডে। যতবারই আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছি, তাকে খুঁজেছি। ইন্টারনেটে, ফেসবুকে—কোথাও পাইনি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। হঠাৎ আমার মোবাইলে একটি ফোন পাই। থাই মহিলা জানতে চাইল আমার নাম। তারপর বলল, তার বস অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বড় কর্তা আমাকে খুঁজছেন। অবাক হয়ে নাম জানতে চাইলাম। নামের সঙ্গে আমার পরিচিত কারো মিল হচ্ছিল না, তাই ভাবছিলাম; তখন সে বলল তার আগের নামটি। এই সেই আমার থাই বন্ধু! কী আশ্চর্য। এও নাম পাল্টিয়েছে? তার সঙ্গে কথা হলো। তখন ইতাল-থাই আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। সে থাই সরকারের হয়ে বাংলাদেশ সফরে আসবে। আসার আগে তার পিএসকে বলেছে আমাকে খুঁজে বের করতে। ঢাকায় যখন দেখা হলো তখন প্রথম প্রশ্ন ছিল—কেন নাম পাল্টিয়েছ? নাম বদলিয়েছ বলেই আমি তোমাকে খুঁজে পাইনি। বহুবার থাইল্যান্ডে গিয়েছি, তোমাকে খুঁজেছি। কী কারণে নাম বদলালে? মনে মনে ভাবছি আর কী কারণে নাম বদলানো যায়? জানাল, তাকে এক জোতিষী জানিয়েছে যে তার নাম অপয়া। নাম না বদলালে তার শনির দশা কমবে না। স্ত্রীর সঙ্গে তার ভয়ংকর ঝামেলা ছিল বলেই জানতাম। বলল, নাম বদলানোর পরই তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়। তার বর্তমান স্ত্রী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

ফিরে যাই ১৯৯২ সালে। তখনো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়নি। আমি তখন বিএ পরীক্ষার অর্থনীতি বিষয়ের টেবুলেশন করছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের নাম ও পাশে নাম্বার লিখছি। কে কী পেল। যতই দেখছি নাম পড়ে হাসছি। নামের বাহার প্রচুর কিন্তু বহু নামেরই বানান বিতিকিচ্ছিরিভাবে লেখা। দেখলেই মনে হচ্ছিল ছাত্রটির পূর্বপুরুষের কেউই পড়াশোনা করেনি। তাই নামের বানান এমন। কী করা? নামের বানান শুদ্ধ করা যাবে কি? করলে হয়তোবা কোনো দিন সে বড় কোনো পদে চাকরি করলে লোকজন হাসবে না কিংবা তারাও হয়তোবা আমার মতন ভাববে না। ভাবলাম নামগুলো শুদ্ধ করে লিখে দিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে গিয়ে বললাম, টেবুলেশন করছি কিন্তু নামের বানান প্রচুর ভুল। কেন যে তারা নামটি শুদ্ধ করল না। এখন তাদের জন্য খারাপই লাগছে। তাদের নাম দেখে কেউ মুচকি হাসবে, কেউ চিমটি কাটবে, কেউ ভাববে পূর্বজন্মে কেউ শিক্ষিত ছিল না। কী করা যায় বলুন? মাথায় হাত দিয়ে তিনি বললেন, খবরদার নামে হাত দেবেন না। ওটা তাদের নাম। যেভাবে লিখেছে সেটাই শুদ্ধ। আমরা বদলাতে পারব না। হুম। কিন্তু! আমার মনের প্রশ্ন দেখে তিনি বললেন, দেখুন আপনি বিএ পরীক্ষায় নাম বদলালে সে আরো বিপদে পড়বে। কারণ তার বাকি সব পরীক্ষায় ওই বানানেই নাম লেখা হয়েছে। তাই বলে সে বদলাল না? তা সে জানে। আমরা নাম যেভাবে আছে সেভাবেই লিখব। মানতে হলো।

সেদিন আমার এক ছাত্রের নাম দেখে আবার চমকে উঠলাম। বীভৎস। কী করে এমন হলো? তাকে ডাকলাম আমার কক্ষে। বললাম, তোমার নামের এমন অবস্থা কেন? জানাল, স্যার, আমার গ্রামের আমিই প্রথম মেয়ে যে মাধ্যমিক পাস করেছি। সে সময় কী করে যে ভুল হলো, ছোট ছিলাম। এখন কী করা? বুঝতে পারলাম নাম বদলানো আমাদের কাছে অসম্ভব বিষয়। তাই ভুলভাল নাম বহন করেই আমরা অভ্যস্ত।

যা বলছিলাম। সেই চীনা বন্ধু ২০১৫ সালে আমাকে খুঁজে পেল। লিংকডইনে। জানাল, কেমন আছ বন্ধু, বহুদিন তোমাকে খুঁজেছি। শেষ পর্যন্ত তোমাকে পেলাম। তারপর থেকে প্রতি মাসেই তার সঙ্গে কথা হয়। এখনো মনে হয় সেই সময়েই আছি। সে এখন আমেরিকার সিয়াটল শহরে বাস করে। একটি বড় ব্যাংকের ডাটাবেজ সামলায়। কভিডে বাসায় বসেই কাজ করে। সে কানাডায় থাকেনি। কাজ করত মাইক্রোসফটে, তবে ছেড়ে দিয়েছে। চাপ কমানোর জন্য। এখানে কাজ কম। দায়িত্ব বেশি। আমার ঔৎসুক্য কমেনি। জানতে ইচ্ছে করল, নাম বদলের পরও তার পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ কেমন। বলল, তার ভাইয়ের সঙ্গে তার যথেষ্ট যোগাযোগ। সে নিজে এর মধ্যে আবারো হার্ভার্ড থেকে ফার্মাকোলজিতে ডিগ্রি করেছে। কী বলো? আবার ফার্মাকোলজিতে? কী কারণ? বলল, আমার মনে অনেক প্রশ্ন, তাই ভাবলাম শরীর সম্পর্কে জানতে চাই। আশ্চর্য। না, আমি এখন অবসর সময়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দিই। আমার অনেক 'রোগী' আছে, যারা প্রচলিত ওষুধের বদলে আমার পরামর্শ গ্রহণ করে। ওষুধের অনেক অপকারিতা আছে। বললাম, কতদিন বাঁচতে চাও? বলল, আমি এখনো সেই আগের মতোই আছি। সেই এনার্জি। আমার ইচ্ছা অন্তত ১২০ বছর বাঁচার। বললাম, তুমি বাকি ৬০ বছর কী দিয়ে খাবে? আয় কোত্থেকে আসবে? বলল আমি ৮০ বছর পর্যন্ত কাজ করব। তারপর ৪০ বছর অবসর কাটাব। তার কথায় আমি অবাক। সে কী বলছে? আমরা যেখানে ৬০ বছরেই ভাবি এক পা কবরে গেছে, সেখানে সে ভাবছে ৮০ বছর পর্যন্ত কাজ করবে। তার কর্মক্ষমতা থাকবে? কভিডের ভয়ে আমাদের সবাই যেখানে মৃত্যুভয়ে ভীত, সেখানে সে এখনো ভাবতে পারছে আরো ৬০ বছরের জীবন। তার অনেক কথায় আমারও মনে হলো সম্ভব। কিন্তু তাতে আমাদের বাস করতে হবে মাটির সঙ্গে। এ পৃথিবীর তাপ, মাটি, ধূলিকণা আমাদের গায়ে লাগলে আমরা তা দ্রুততার সঙ্গে ঝেড়ে ফেলি। ভাবি ময়লা আবর্জনা। কিন্তু তার ভাষায়, মাটির সঙ্গে আমাদের দেহের সংস্পর্শ আর সূর্যের তাপের সঙ্গে আমাদের সংযোগ আমাদের দেহের প্রাণশক্তি বাড়ায়। নতুন উদ্যম কিংবা নতুন শক্তির জন্ম দেয়। তার প্রতিদিনের নিয়মের মধ্যে রয়েছে খালি পায়ে ঘাসে হেঁটে বেড়ানো। সূর্যের তাপ গায়ে লাগানো। তার মতে, প্রতিদিন সূর্য পৃথিবীকে দেয় নতুন শক্তি। পৃথিবী তা বিকিরণ করে। মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলে দেহে তা প্রবেশ করে। দেহ তখন রোগবালাই দূর করতে এ শক্তি ব্যবহার করে। এ পৃথিবীতে নতুন শক্তি দেয় কেবল সূর্য। তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ দুভাবে হয়। এক. সরাসরি গায়ে তা লাগানো। আর দুই. মাটির সঙ্গে দেহের সংস্পর্শ। তাই সে খালি পায়ে প্রতিদিন হাঁটে। তার ভাবনা, তার উদ্যম কি সত্যি? আমার পক্ষে সঠিক উত্তর বলা মুশকিল, তবে ভাবনাটা কি ফেলে দেয়া যায়!

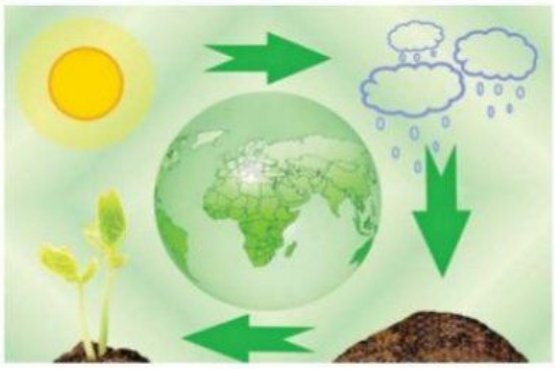

আমার চীনা বন্ধুর ভাষায়, মাটির সঙ্গে আমাদের দেহের সংস্পর্শ আর সূর্যের তাপের সঙ্গে আমাদের সংযোগ আমাদের দেহের প্রাণশক্তি বাড়ায়। নতুন উদ্যম কিংবা নতুন শক্তির জন্ম দেয়। তার প্রতিদিনের নিয়মের মধ্যে রয়েছে খালি পায়ে ঘাসে হেঁটে বেড়ানো। সূর্যের তাপ গায়ে লাগানো। তার মতে, প্রতিদিন সূর্য পৃথিবীকে দেয় নতুন শক্তি। পৃথিবী তা বিকিরণ করে। মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলে দেহে তা প্রবেশ করে। দেহ তখন রোগবালাই দূর করতে এ শক্তি ব্যবহার করে

ড. এ. কে. এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট